রাজনীতির রবীন্দ্রনাথ -১

সৈয়দ আবুল কালাম

দিন যতই যাচ্ছে ততই রবীন্দ্রনাথ আরও ব্যপক থেকে ব্যপকতর পরিসরে আলোচিত হচ্ছেন। রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, মানবতাবাদ, আন্তর্জাতিকতাবাদ — এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে রবীন্দ্রনাথের নিত্য নতুন অবদান আবিস্কৃত হচ্ছে না।

সমাজতন্ত্রের 'ব্যর্থতা' কেন? বলা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ সেই বিশের দশকেই 'রাশিয়ার চিঠি'তে সমাজতন্ত্রের জবরদস্তি সম্পর্কে সতর্ক-সংকেত উত্থাপন করেছিলেন। আইনষ্টাইন-রবীন্দ্রনাথ আলোচনার প্রসঙ্গ টেনে বলা হচ্ছে , তিনি আইনষ্টাইন ও তৎকালীন প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিকদের মতই বা আরো ভালোভাবে বিজ্ঞানের দর্শন ও জ্ঞানতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাঁর কৃষি কর্মকান্ড, সমবায় প্রচেষ্টা, ক্ষুদ্র ঋণ ইত্যাদি প্রসঙ্গ সন্নিবেশিত করে গড়ে তোলা হচ্ছে রবীন্দ্র-অর্থনৈতিক মতবাদ। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা, আইনী ভাবনা, কারাগার-বন্দীমুক্তি প্রসংগ, সংবাদপত্রের কন্ঠরোধ বিরোধিতা, তাঁর মানস ও রাজনীতি এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, ইত্যাকার অসংখ্য শিরোনামে বিভিন্ন বুদ্ধিজীবি রচিত গবেষনা কর্ম প্রকাশিত হয়েই চলেছে। বলা যায় আমরা এক রবীন্দ্র-জোয়ারে অবগাহন করছি। বুদ্ধিজীবিরা লিখছেন ও বলছেন এবং তরুণরা শুনছেন ও হৃদয়ঙ্গমের প্রয়াস পাচ্ছেন। জনগনের মধ্যেও তা অবিরাম ছড়িয়ে পড়ছে পরোক্ষভাবে।

এটা প্রশ্নাতীত যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আগাগোড়া এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর জীবনকালে তিনি প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক সন্ধিক্ষনে ও গুরুত্বপুর্ন রাজনৈতিক প্রশ্নে বক্তব্য রেখেছেন। তিনি তা করেছেন শুধু তাঁর লেখনীর মাধ্যমেই নয়, অধিকাংশই প্রকাশ্য

জনসমাবেশে পেশ করেছেন । নিজস্ব রাজনৈতিক মতবাদের প্রশ্নে তিনি ছিলেন সুস্পষ্ট ও দৃঢ়। তৎকালীন রাজনৈতিক অঙ্গনে ছিল তার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ও যোগাযোগ। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিশেষভাবে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সাথে তার ছিল অব্যাহত আত্মিক সম্পর্ক। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও তিনি ছিলেন সচেতন। এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুপরিসর সাহিত্যিক জীবনে সুনির্দিষ্ট একটি রাজনৈতিক দন্ডের ওপর দিয়ে দৃপ্ত পদক্ষেপে হেঁটে চলেছেন এবং কখনও তিনি তার পথ ও বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হননি। তিনি একজন সচেতন রাজনৈতিক-সাহিত্যিক।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে প্রথমে বোঝা প্রয়োজন তার সুবিশাল সৃষ্টির অন্তর্নিহিত রাজনীতি ও রাজনৈতিক দর্শন। এটা আরও বেশী প্রয়োজন এ কারনেই যে আজও ভারত ও বাংলাদেশের চিন্তাজগতে তার প্রভাব অতলস্পর্শী।

অবশ্য, রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক-দার্শনিক চিন্তাধারা নিছকই একজন মহাপ্রতিভাবান ব্যক্তির অনন্যসাধারণ চেতনা থেকে উৎসারিত — এমন ভাবাটা যথার্থ নয়। তিনি ব্রিটিশ ভারতের সাংস্কৃতিক জগতের একটি বিশেষ ধারার প্রতিনিধিঃ যে ধারাটি সুচনা করেছিলেন রামমোহন রায়; তারপর বঙ্কিমচন্দ্র রামকৃষ্ণ প্রমুখের হাতে সুপুষ্ট হয়ে উত্তরাধিকার হিসাবে অর্পিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের উপর। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ও পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও ছিলেন এই ধারার শক্তিশালী পূর্বসুরী। ধারাটি ব্রিটিশ ভারতের জনগোষ্ঠীর একটি অংশ বা ব্লক, আরো স্পষ্ট করে বললে একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক শ্রেণীর চাহিদা, ধ্যান-ধারণা ও চেতনার নির্যাসকে ধারণ ও প্রতিনিধিত্ব করেছে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই ধারার সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। এই ধারাটি রবীন্দ্রনাথে এসে পুর্ণতা পেয়েছে। এর একটি কারণ অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রতিভা। তবে আরও গুরুত্বপুর্ণ কারণ তাঁর জীবনকালের যুগসন্ধিক্ষন।

রবীন্দ্রনাথের জন্মের (১৮৬১ সন) অব্যবহিত পূর্বেই ভারত জুড়ে সংঘটিত হয় ১৮৫৭ সনে বৃটিশ বিরোধী প্রথম স্বাধীনতার সশস্ত্র সংগ্রাম। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা একে তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহ নামে অভিহিত করেছিল। কিন্তু এ সংগ্রাম যে জনগনের এক বিশাল ও সর্বব্যপী উত্থান ছিল এবং এদেশে ব্রিটিশ রাজত্বের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল তা তারা গোপণ করতে পারেনি। এর একবছর পূর্বেই হয়েছিল মহান সাঁওতাল বিদ্রোহ। তারও পূর্বের একশত বছরের ইতিহাস ছিল বৃটিশ ও তাদের দ্বারা সৃষ্ট জমিদারতন্ত্র বিরোধী অব্যাহত সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাস। এই একশত বছর ব্যাপী ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা যুদ্ধ চালিয়ে গেছে ও সীমাহীন নির্মমতা প্রদর্শন করেছে এইসব ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে নস্যাৎ করার জন্য এবং ভারতবর্ষ জুড়ে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য। পলাশীর যুদ্ধের পর প্রায় একশত বছর লেগে গিয়েছিল তাদের পুরো ভারত জয় করতে। রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন যে সুসমৃদ্ধ, সুশিক্ষিত ও রাজনীতি সচেতন ঠাকুর পরিবারে, তা ইতিহাসের এই জ্বলন্ত চুল্লি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না, বরং ছিল এরই এক অংশীদার।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথমার্ধ (১৮৬১-১৯০০) কেটেছে উনবিংশ শতাব্দীতে, দ্বিতীয়ার্ধ (১৯০০-১৯৪১) বিংশ শতাব্দীতে। তার জীবনের প্রথমার্ধে (১৮৬১-১৯০০) ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গন ছিল উত্তপ্ত, ব্রিটিশ বিরোধী সর্বাত্মক গণ-উত্থানের মুখোমুখী এবং একইসাথে ব্রিটিশ-সৃষ্ট পৌণপুনিক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত। ভারতে ইতিমধ্যেই ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত একটি মধ্যশ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে এবং তাঁরা তাঁদের জীবন-জীবিকা, পেশা ও অধিকারের স্বার্থে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর সাথে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে জড়িয়ে পড়ছেন। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একাংশ যেমন আপোষপন্থী আর একাংশ তথা রেডিক্যাল অংশ ব্রিটিশ-বিরোধী চরমপন্থার দিকে আগানো শুরু করেছেন। ব্রিটিশ আনুগত্যে ভারতীয় একটি শিল্পীয় বুর্জোয়া শ্রেনী জন্ম নিচ্ছে এবং সৃষ্টি হয়েছে ব্রিটিশ অনুগত বুর্জোয়া ও সামন্ত জমিদার শ্রেণীর

পুর্নাঙ্গ রাজনৈতিক দল কংগ্রেস। শিল্পীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর হাত ধরেই জন্ম নিয়েছে ও বিকশিত হচ্ছে আধুনিক শিল্পীয় শ্রমিক শ্রেণী এবং আন্দোলন সংগ্রামের মঞ্চে শুরু করেছে তাদের পদচারনা। আন্তর্জাতিক পরিসরে বৃটিশসহ ইউরোপ ও আমেরিকার পুঁজিবাদ ইতিমধ্যেই ব্যপকভাবে একচেটিয়া পুজিবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়েছে এবং বিশ্বের প্রাথমিক উপনিবেশিক ভাগ-বাঁটোয়ারা মুলতঃ সম্পন্ন করেছে। ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯) ও আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে অর্জিত স্বাধীনতা-সাম্য-গণতন্ত্রের মহান দীক্ষার পথ পেরিয়ে আবিস্কৃত হয়েছে সমাজতন্ত্রের বিশ্ববীক্ষা। ১৮৭১ সালে হয়েছে রক্তাক্ত প্যারী কমিউণ, শ্রমিক শ্রেণী ও শোষিত মানুষের প্রথম রাষ্ট্র।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের দ্বিতীয়ার্ধে উপনিবেশ ও প্রভাবাধীন এলাকার পুনর্বন্টনের উন্মত্ত প্রতিযোগিতায় সংঘটিত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, জন্ম নেয় শ্রমিক শ্রেণী ও শোষিত মানুষের দুনিয়া কাঁপানো বিপ্লব রুশ বিপ্লব; সাম্রাজ্যবাদ-নিপীড়িত দেশে দেশে দেখা দেয় জাতীয় মুক্তি ও গণতন্ত্রের সংগ্রাম— যার জোয়ারে ভারতবর্ষ হয়ে ওঠে ব্রিটিশ বিরোধী মুক্তিসংগ্রামে উত্তাল এবং চীনে সৃষ্টি হয় মহান বিপ্লবী সংগ্রাম। রবীন্দ্রনাথ তার জীবনের শেষ প্রান্তে এসে প্রত্যক্ষ করেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা।

সুতরাং এক জটিল ও আন্দোলিত যুগসন্ধিক্ষনের পথচারী ছিলেন তিনি। তাঁর সাহিত্যে তিনি এরই প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং তা করেছেন তাঁর সুবিশাল প্রতিভার সাথে নিজ রাজনৈতিক দর্শনকে নিখাতভাবে সংশ্লেষিত করে। যে যুগের পথিক তিনি (বিশেষত জীবনের দ্বিতীয়ার্ধ) তা আজও বহাল। একারণে রবীন্দ্রনাথ সদর্পেই বিরাজ করছেন। তিনি আজও প্রাসঙ্গিক। রবীন্দ্র-প্রভাব আজও সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী। এই প্রভাবের আরও একটি কারণ ভারতে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং বাংলাদেশে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ।

রবীন্দ্রনাথ মুলত প্রথমটি ধারণ করলেও দ্বিতীয়টিও তার লেখনী থেকে কিছু পরিমানে নিংড়ে নেওয়া সম্ভব।

রবীন্দ্রসাহিত্যকে তার সারবস্তুতে বুঝতে হলে প্রথমেই বিশ্লেষনে আনা উচিত তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্য, বিশেষত তার রাজনৈতিক-দার্শনিক প্রবন্ধ। এখানেই তিনি তার মতবাদকে স্পষ্ট বিবৃত করেছেন। এরপর তার কিছু উপন্যাস ও নাটক। তাহলেই তার গল্প, কবিতা ও গানসহ তার বিশাল ব্যাপ্ত সাহিত্যের মর্মবস্তু ব্যাখ্যা করাটাও অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে দাঁড়ায়।

রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে নিছক মূল্যায়ন যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন তার লেখনী থেকে বেশ পরিমাণে উদ্ধৃত করা এবং সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তা বিশ্লেষন করা। পাঠকের সামনে বিশ্বাসযোগ্য উপস্থাপন এবং তাঁর অনুসন্ধিৎসাকে উদ্দীপ্ত করার জন্য এটা প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ উনবিংশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এবং বিংশ শতাব্দীর প্রায় অর্ধেক জুড়ে তিনি তাঁর সৃষ্টির আলো ছড়িয়েছেন। একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও তিনি প্রাসঙ্গিক। তাকে বুঝলে আমরা অতীত ঐতিহ্যকেও বহুলাংশে বুঝবো। আমরা বুঝতে সক্ষম হবো, আজকে পথ চলতে গিয়ে আমরা অতীত ঐতিহ্যকে গ্রহন করবো কি না, করলে কতটুকু করবো, নাকি আমরা অতীত ঐতিহ্যের একটা অংশকে পুরোপুরি বর্জন করবো এবং বলব এ ঐতিহ্য আমাদের তথা সাধারণ মানুষের নয়।

শুরু করা যাক রবীন্দ্রনাথের যখন পরিণত যুবক, সে সময়ের গুরুত্বপূর্ণ রচনা 'মন্ত্রি-অভিষেক' থেকে। এরপর ধারাবাহিকভাবে অন্যান্য রচনা আলোচিত হবে।

মন্ত্রি-অভিষেক

(এক)

প্রবন্ধের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> ‘‘ভরসা করিয়া বলিতে পারি এমন অবিশ্বাসী এ সভায় কেহই নাই যিনি বলিবেন ভারতের উন্নতিই ভারতশাসনের মুখ্য লক্ষ্য নহে। অবশ্য , ইংরাজের ইহাতে আনুসঙ্গিক লাভ নাই এমন কথাও বলা যায় না। কিন্তু নিজের স্বার্থকেই যদি ইংরাজ ভারতশাসনের প্রধান উদ্দেশ্য করিতেন তবে আমাদের এমন দুর্দশা হইত যে ক্রন্দন করিবারও অবসর থাকিত না।’’

ইংরেজের ভারতবর্ষ দখল, উপনিবেশকরণ ও শাসনের মুল উদ্দেশ্য ভারতের উন্নতি! তাদের নিজেদের লাভ নিছক আনুসঙ্গিক! এ কথা বলছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৮৯০ সালে, বয়স যখন ত্রিশ, তিনি পরিণত, বিলেত ঘুরে এসেছেন, পৈতৃক জমিদারী পরিভ্রমণ ও তদারকি করেছেন এবং ইতিমধ্যেই সাহিত্য সাধনায় গুরুত্বপুর্ণ অবদানও রেখেছেন। আলোচ্য নিবন্ধ ‘মন্ত্রি-অভিষেক’; রবীন্দ্রনাথ সেটি পাঠ করেন কলকাতার এমারেল্ড থিয়েটারে এক বিরাট সভায়, ২৬ এপ্রিল, ১৮৯০। সভায় সভাপতিত্ব করেন তারই অগ্রজ, জমিদার সংঘের তদনীন্তন সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।[১] সমকালীন সমালোচক ঠাকুরদাস মুখোপধ্যায় তখনই রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করে লিখেছিলেন, ‘‘ভারতের উন্নতি ভারত শাসনের উদ্দেশ্য হইলেও তাহা ‘মুখ্য উদ্দেশ্য’ নহে – গৌণ উদ্দেশ্য। পরন্তু ইংরাজ গবর্মেন্ট-অনুষ্ঠিত ভারত-উপকার ‘নিঃস্বার্থ’ বা ‘নিষ্কাম’ নহে, – তাহা স্বার্থমূলক ও সকাম ।’’[২]

রবীন্দ্রনাথ লিখছেন,

> ‘‘ইংরাজের সাংঘাতিক সংঘর্ষে মাঝে মাঝে আমাদের দুর্বল প্লীহা এবং অনাথ মানসম্ভ্রম শতধা বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এ কথাটা গোপণ করিয়া রাখা সহজ হইতে পারে কিন্তু বিস্মৃত হওয়া সহজ নহে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভারতবর্ষীয় ইংরাজের এই স্বাভাবিক রূঢ়তা আমরা যদি চর্মের উপরে ও মর্মের মধ্যে প্রাণান্তিকরূপে অনুভব না করিতাম তবে ইংরাজ গবর্মেন্টের উদারতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে বিশ্বাস আমাদের পক্ষে কত সহজ হইত।’’

রবীন্দ্রনাথ ‘ভারতবর্ষীয় ইংরাজ’ এবং ইংরেজ গবর্মেন্ট – এই দুটোকে পৃথক করছেন। অথচ দুটোই একই সুত্রে গাঁথা – ইংরেজের উপনিবেশিক শাসন। ভারতবর্ষীয় ইংরাজের ‘স্বাভাবিক রূঢ়তা’য় তিনি পীড়িত, অথচ ইংরেজ শাসকদের ‘উদারতা ও উপকারিতা’য় তাঁর বিশ্বাস দৃঢ়। তাঁর লেখনী থেকে এটা স্পষ্ট যে তিনি যে সমাজের অন্তর্গত, সেই শিক্ষিত ও অভিজাত অংশের মধ্যেও তখন অনেকে ছিলেন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সমালোচনামুখর।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা ভুল মনে করেন। তাই তিনি লিখছেন,

> ‘‘মানুষের স্বভাব এই, অপরাধীর প্রতি রাগ করিয়া তাহার সম্পুর্ণ নিরপরাধী উর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষের প্রতি কাল্পনিক কলঙ্ক আরোপ করিয়া কিয়ৎ-পরিমাণে সান্তনা অনুভব করে। তেমনি আমরা অনেক সময়ে দলিত প্লীহাযন্ত্রের যন্ত্রণায় কোনো বিশেষ ইংরাজ কাপুরুষের প্রতি রাগ করিয়া গবর্মেন্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা বিস্মৃত হই।’’

অর্থাৎ তাঁর ভাষায় উপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী এবং তার ‘উর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষ’ তথা পূর্ববর্তী শাসকরা ‘সম্পুর্ণ নিরপরাধী’। তাদের বিরুদ্ধে নিন্দা বা কলঙ্ক কাল্পনিক, সত্য

নয়। বরং তা হচ্ছে সামনের কোন 'বিশেষ ইংরাজ' এর দোষকে অকারনে ইংরেজ শাসকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া এবং তাদের 'উদারতা ও উপকারিতা'র প্রতি 'কৃতজ্ঞতা বিস্মৃত' হওয়া।

এখানেই থেমে থাকেননি রবীন্দ্রনাথ। নিজেকে তিনি আরও স্পষ্টতর করেছেন:

> ''ভ্রমের কারণ মন হইতে দুর করিয়া সেই ব্যক্তিগত অপমানজ্বালা বিস্মৃত হইয়া আমরা যদি স্থিরচিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখি তবে নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে যে ইংরাজ গবর্মেন্টের নিকট হইতে আমরা এত বহুল সুফল লাভ করিয়াছি যে তাহার নিঃস্বার্থ উপকারিতা সম্মন্ধে অবিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে কৃতঘ্নতা মাত্র।''

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ভারতবর্ষীয় ইংরেজদের নিপীড়নমূলক আচরন 'ব্যক্তিগত অপমানজ্বালা' তথা ব্যক্তিগত মান-অপমানের প্রশ্ন। ব্রিটিশ শাসনাধীনে যাঁরা ছিলেন ভারতীয় অভিজাত ও উচ্চশ্রেণী, যাঁরা ব্রিটিশের কল্যাণে সম্পদ, 'সম্মান' ও সাধারণ জনগণের উপর প্রভূত্বের ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন, তাঁদের জন্য ইংরেজদের দৈনন্দিন নিষ্ঠূর আচরণ ছিল 'ব্যক্তিগত অপমানজ্বালা' বা মান-অপমানের প্রশ্ন। এঁদের প্লীহাও ছিল দুর্বল এবং মানসম্ভ্রমও ছিল অনাথ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে যা উন্মোচিত হয়নি তা হল, ভারতবর্ষীয় ইংরেজদের দৈনন্দিন নিষ্ঠুর আচরণ ছিল ভারতবর্ষের সমস্ত জাতি ও জনগণের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের অসহনীয় বর্ণবাদী ও জাতিগত নিপীড়ন। তাই নিছক 'ব্যক্তিগত অপমানজ্বালা' হিসেবে তা বিস্মৃত হওয়ার প্রশ্ন আসে না। বরং এ থেকে বেরিয়ে আসে সমষ্টিগত সংগ্রামের প্রশ্ন। এর মূল উৎস নিহিত ছিল ব্রিটিশের হাতে ভারতের পরাধীনতায়।

নীচের উদ্ধৃত অংশ থেকে আমরা সে সময়ের কিছু চিত্র পেতে পারি, যার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন নিশ্চিতভাবে রবীন্দ্রনাথও [৩]:

> ‘‘শ্বেতচর্মদের হাতে হেনস্থার ঘটনা প্রায় প্রত্যেকেরই অভিজ্ঞতায় ছিল। ট্রেন থেকে সাহেবরা তাদের অন্যায়ভাবে নামিয়ে দিত, রেস্টুরেন্টে ঢুকতে দিত না, অফিসে সাহেব ওপরওয়ালা কারণে-অকারণে অশ্রাব্য গালাগাল ও অপমান করত। শিক্ষা, সমৃদ্ধি ও মর্যাদায় যেসব ভারতীয় ছিল অনেক ওপরদিকে, তাঁদের জীবনেও এসব ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। আর ভদ্রলোকদের ক্ষেত্রে যেটা ছিল পক্ষপাতমূলক আচরণও মৌখিক অমর্যাদা, সেটা নিম্নবর্গীয় মানুষদের ক্ষেত্রে হয়ে যেত লাথি ও ঘুষি। বিনা দোষে বা সামান্য অপরাধে সাহেবের বুটে পিলে ফাটত তাদের অনেকেরই।’’ বাস্তব অবস্থা ছিল এর চেয়েও অনেক ভয়াবহ।

রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত ‘ইংরাজ গবর্মেন্টের ... এত বহুল সুফল লাভ’ এর সত্যতা আমরা এই প্রবন্ধের পরের অংশে প্রকৃত ইতিহাস থেকেই যাচাই করে নিতে সক্ষম হব। কিন্তু তিনি যে বলছেন, “ইংরাজ গবর্মেন্টের নিঃস্বার্থ উপকারিতা সম্মন্ধে অবিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে কৃতঘ্নতা মাত্র’’ – এই যদি ইতিহাসের সত্য হয়, তাহলে পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ইংরেজবিরোধী যে একের পর এক কৃষক বিদ্রোহ ও মুক্তিসংগ্রাম হয়েছিল, তা সবই হয়ে পড়ে কোটি কোটি ভারতবাসীর কৃতঘ্নতা, কেননা এগুলো সর্বদাই ছিল ব্যাপক বিপুল ভারতীয় জনগণের অংশগ্রহনে পরিপুষ্ট। ‘‘বিদেশী শাসনের চাপ সবচেয়ে বেশি পড়েছিল সমাজের সবচেয়ে নিচের তলার সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী অর্থাৎ কৃষক সম্প্রদায়ের উপর। দুরবস্থা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে তারা প্রায়শ আশ্রয় নিয়েছে বিদ্রোহের। কোম্পানির শাসনের চাপ

পড়েছিল উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর উপরে, তাদের চিরকালীন অরণ্য অধিকারের উপরে এবং ফলে তাদেরও প্রতিরোধে সামিল হতে দেখি অনেক বিদ্রোহে।

সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ থেকে সাঁওতাল বিদ্রোহ পর্যন্ত কোম্পানীর শাসন জুড়ে এমন অনেক কৃষক বা উপজাতীয় গনবিদ্রোহের কাহিনী আমাদের জানা। ..... কোম্পানীর শাসনের বিরুদ্ধে সবৃবৃহৎ প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল ১৮৫৭ সালে ...।"[৪]

নিজ বক্তব্যকে আরও প্রসারিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ:

> "যখনই তোমাদের নিকট উন্নত অধিকার প্রত্যাশা করি তখনই তোমাদের মহৎ মনুষত্বের প্রতি কী সুগভীর আন্তরিক ভক্তি প্রকাশ হইয়া পড়ে। তোমরা আপন রক্তপাত করিয়া ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছ এবং আপন প্রচন্ড বলে এই আসমুদ্র আহিমাচল বিপুল ভারতভূমিকে করতলন্যস্ত আমলকের ন্যায় আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছ।"

পলাশীর যুদ্ধের পর প্রায় একশত বছর লেগে যায় ইংরেজদের সম্পুর্ন ভারতবর্ষ দখল করতে এবং তারা তা করে তাদের তরবারী ও ষড়যন্ত্রের উপর নির্ভর করে। তারা একের পর এক দেশীয় রাজ্যগুলোকে দখল করে নেয় এবং একই সাথে কৃষক-আদিবাসী জনগণের একের পর এক গনবিদ্রোহকে নির্মমভাবে পরাজিত করতে সফল হয়। এরপরও ইংরেজ স্বস্তি পায় নি। ১৮৫৫-৫৬ সালে হয় মহান সাঁওতাল বিদ্রোহ । ১৮৫৭ সালে ঘটে ভারতীয় মহাবিদ্রোহ তথা প্রথম স্বাধীনতার সশস্ত্র সংগ্রাম। শেষপর্যন্ত ইংরেজ বিজয়ী হয় এবং তরবারীই ছিল সর্বক্ষেত্রে নির্ধারক। এই ইতিহাস ছিল রক্তাক্ত ইতিহাস । লক্ষ লক্ষ ভারতীয় জনগন ইংরেজের তরবারীর আঘাতে জীবন দেন। ইংরেজেরও রক্তপাত ঘটে এবং তা ঘটে ভারতবাসীর তরবারীর প্রত্যাঘাতে। রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ শাসকদের "মহৎ মনুষত্বের প্রতি"

''সুগভীর আন্তরিক ভক্তি" তে অবনত; ব্রিটিশ ''আপন রক্তপাত করিয়া ভারতবর্ষ অধিকার'' করেছে তাই তিনি অভিভূত, কৃতজ্ঞ ও সমবেদনায় ব্যথিত; তারা সাফল্যের সাথে''আপন প্রচন্ড বলে এই আসমুদ্র আহিমাচল বিপুল ভারতভূমিকে করতলন্যস্ত আমলকের ন্যায় আয়ত্ত" করে রেখেছে, এজন্য তিনি পরিতৃপ্ত ও বিস্ময়াবিষ্ট ।

ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বিপরীত বৈরী পক্ষ ছিল ভারতীয় জনগন, যাঁদের গভীর অন্তস্থল থেকে বারংবার উত্থিত হয়েছিল সন্নাসী-ফকির-কৃষক-আদিবাসী বিদ্রোহীরা । তাঁদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনোভাবটা কি? তাঁরা কি ব্রিটিশের ''মহৎ মনুষত্বের' বিপরীতে হিংস্র পশুত্বের প্রতীক? তাঁরা কি 'সুগভীর আন্তরিক ভক্তি'র বিপরীতে সীমাহীন ঘৃণায় বর্জিত? তাঁদের পরাজয় কি উল্লাসের-আনন্দের? যে ''আসমুদ্র আহিমাচল বিপুল ভারতভূমিকে করতলন্যস্ত আমলকের ন্যায়" পরাধীন করে রেখেছিল 'প্রচন্ড বলে'র অধিকারী ব্রিটিশ, সেই পরাধীনতাই কি রবীন্দ্রনাথের কাম্য? কোন পক্ষে অবস্থান রবীন্দ্রনাথের?

নিজ অবস্থান প্রকাশে অবশ্য তিনি দ্বিধান্বিত নন:

> ''তোমাদের খাপের মধ্য হইতে যেমন তরবারী মধ্যে মধ্যে মহেন্দ্রের বজ্রের ন্যায় আপন বিদ্যুত-আভা প্রকাশ করিয়াছে , তেমনি তোমাদের অন্তরের মধ্যে যে দীপ্ত মনুষত্বের মহিমা বিরাজ করিতেছে তাহাও প্রবল শাসনের মধ্য হইতে মাভৈঃ শব্দে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে ।''

'মহেন্দ্রের' অর্থ দেবরাজ ইন্দ্রের । রবীন্দ্রনাথের মতে, ইংরেজের তরবারীতে দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রের 'বিদ্যুৎ-আভা' । ইংরেজ শাসক তাই আর্য দেবতা ইন্দ্র সদৃশ । বিদ্রোহী ভারতবাসীর তরবারী তাহলে কার? দানবের? কৃতঘ্নের? দুস্কৃতিকারীর? আর বিদ্রোহী

ভারতবাসী? তারাই বা কি? রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে ইংরেজের রক্তপাত মহান। যে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় জনগণ ইংরেজ তথা ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে তখন পর্যন্ত জীবন দিয়েছিল , তাঁদের আত্মত্যাগের মূল্যায়ন তাহলে কি? তাঁদের রক্তপাত কি ধরণের?

সাঁওতাল বিদ্রোহের মহান নেতা কানুকে ইংরেজ উপনিবেশবাদীরা ফাঁসি দেয় ১৮৫৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী। তাঁর বয়স তখন মাত্র ছত্রিশ বছর। ব্রিটিশ বিরোধী এই সুমহান বিদ্রোহে 'পঞ্চাশ হাজার বিদ্রোহী সাঁওতালের মধ্যে পঁচিশ হাজার যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন'।[৫] ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে কানু নির্ভীক কণ্ঠে ঘোষণা করেন, ''ছ বছরের মধ্যে আমি আবার আসব, আবার সারা দেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে তুলব।''[৬] পঁয়তালিশ মিনিট তাঁর দেহটি ফাসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে রাখার পরে , সেটিকে নামিয়ে এনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। কানুর এই ফাঁসি কি ন্যায়সঙ্গত? সাঁওতাল বিদ্রোহ কি অন্যায়? 'কৃতঘ্নতা?

(দুই)

কানুরা যে বারংবার ফিরে আসে, ব্রিটিশের তাতে কোন সংশয় ছিল না। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের ফলশ্রুতিতে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান হয়, কায়েম হয় মহারানীর শাসন। উপনিবেশিক শোষণ-লুণ্ঠন-দস্যুতা বরং তীব্রতর হয়, যুক্ত হয় নতুন মাত্রা। মহাবিদ্রোহে আতঙ্কিত ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে সমাবেশিত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। তারা দেশীয় সামন্তরাজন্যর্গের রাজ্যগ্রাসের পূর্ববর্তী নীতি বাদ দেয়। তখনো টিকে থাকা সামন্তরাজাদের তথাকথিত স্বাধীন নরপতি হিসেবে মেনে নেয় এবং এভাবে সৃষ্টি করে প্রায় পাঁচ শতাধিক করদ-মিত্র রাজ্য ও তার রাজন্যবর্গ । এই ''ছোট বড় ভারতীয় রাজন্যবর্গ ভারত ভূখন্ডের এক তৃতীয়াংশেরও বেশী শাসন

করত ।"[৭] এরা হয়ে দাঁড়ায় ব্রিটিশ শাসনের স্তম্ভস্বরূপ । এদের "সেনাবাহিনী রাখার অধিকার অব্যাহত ছিল । এগুলি প্রথমত ও প্রধানত সামন্তবিরোধী, ঔপনিবেশিকতাবিরোধী আন্দোলন দমনের জন্যই ব্যবহৃত হত । ... এই রাজারা ছিল ব্রিটিশ সেবাদাস ।"[৮] এইসব সেনাবাহিনী ছিল সামরিক শিক্ষা ও অস্ত্রশস্ত্রের অভাবগ্রস্থ এবং ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রনাধীন । একই সাথে সমস্ত সামন্ত-জমিদার গোষ্ঠীকে নির্মম কৃষক শোষনের আরো অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হয় । ভুমিরাজস্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় । ভারতীয় কৃষকের ঋণগ্রস্ততা সীমাহীন পর্যায়ে পৌছে ।

পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন-শোষণের অনিবার্যতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল পৌনপুনিক দুর্ভিক্ষ । দুর্ভিক্ষ ভয়াল রূপ ধারণ করে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে । রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক সখারাম গনেশ দেউস্কর তার বিখ্যাত প্রবন্ধ 'দেশের কথা'য় (১৯০৪ সাল) পরিস্থিতির এক চিত্র তুলে ধরেছেন । "১৮০১ খ্রিষ্টাব্দ হইতে ১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতে দশ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষজনিত অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল । ..... সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, ১৮৫০ অব্দ হইতে ১৮৭৫ অব্দের মধ্যে ব্রিটিশ ভারতে ছয়বার দুর্ভিক্ষ হয় । তাহাতে পঞ্চাশ লক্ষ ভারতবাসী জঠর-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছে ।"[৯] তিনি আরো বলছেন, ১৮৭৫ -১৯০০ সাল, এই পচিশ বছরে ১৮ বার দুর্ভিক্ষ হয়েছে যার ফলে অনাহারে মারা গেছেন ২ কোটি ৬০ লক্ষ লোক এবং ১৮৭৫-১৮৯০ পনের বছরে এই সংখ্যা ৭০ লক্ষ ।

ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায় লিখেছেন,

> "১৮৭৭ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে এক ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় । এই দুর্ভিক্ষের ফলে পঞ্চাশ হইতে ষাট লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায় । কিন্তু এই দুর্ভিক্ষের মধ্যেই মহারানী ভিক্টোরিয়ার "ভারত-সম্রাজ্ঞী" খেতাব গ্রহণ উপলক্ষে দিল্লীতে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে এক দরবার বসে । কেবল তাহাই

নহে, এই সময়েই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য ভারতবর্ষের বহু কোটি টাকা ব্যয়ে কাবুল আক্রমণ করে।''

সখারাম গনেশ দেউস্কর একই প্রবন্ধে দুর্ভিক্ষের কারণ তুলে ধরেছেন। ''ভারতের এক অংশে অনাবৃষ্টি হইলে অন্য অংশে সুবৃষ্টির কখনও অভাব হয় না। সুবৃষ্টি হইলে ভারতের এক চতুর্থাংশ জমিতে এত শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে যে, তাহাতে দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশসমূহের অধিবাসীদের অনশন-মৃত্যু অনায়াসে নিবারিত হইতে পারে। দেশের সর্বত্র রেলপথ বিস্তার হওয়ায় এক প্রদেশের অন্ন অল্প সময়ের মধ্যে অন্য প্রদেশে প্রেরণ করাও কষ্টসাধ্য নহে। .....আসল কথা এই যে, শস্যাভাব ভারতীয় দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ নহে। ..... ভারতে অন্নাভাব অপেক্ষা অর্থাভাব সমধিক প্রবল। ইংরাজের বানিজ্য-সংগ্রামে জর্জরিত হইয়া আমরা এরূপ কপর্দকশূণ্য হইয়া পড়িয়াছি যে, এক বৎসর দৈব দুর্বিপাকে ক্ষেত্রের শস্য ক্ষেত্রে মরিয়া গেলে আমাদের আর আত্মরক্ষার উপায় থাকে না। ..... দেশবাসীর নিকট যদি শস্য-ক্রয়োপযোগী অর্থ থাকিত, তাহা হইলে ঘোর দুর্ভিক্ষের বৎসরেও আমাদের দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ মণ গোধূম-তণ্ডুলাদি (আটা-ময়দা-চাল) বিদেশে রপ্তানী হইত কেন?'' ইংরেজ শাসকদের উদ্ধৃত করেই তিনি দেখিয়েছেন, ব্রিটিশ শাসনে ভারতের কৃষক জনগণের অর্ধাংশই চিরকাল অর্ধ-অনশনে দিন যাপন করত।

১৮৬১ থেকে ১৮৯০ সালব্যাপী রবীন্দ্রনাথের শৈশব-কৈশোর-যৌবন এগুলো প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু তারপরও তিনি কলকাতায় বিশাল জনসমাবেশে ইংরেজের শাসনের সীমাহীন 'বহুল সুফল', 'নিঃস্বার্থ উপকারিতা' এবং তাঁর বিপুল 'রাজভক্তি' প্রচার করছেন। রবীন্দ্রনাথ একেবারে ভূল বলছেন তা নয়। ইংরেজ শাসন ভারতীয় সাধারণ জনগণের জন্য ছিল অনাহার-দুর্ভিক্ষ-মৃত্যু-দাসত্ব-অধিকারহীনতা-কারাগার-ফাঁসিকাষ্ঠ, কিন্তু ইংরেজসৃষ্ট জমিদার-মহাজন-রাজামহারাজা-বণিক-পুঁজিপতিদের জন্য তা ছিল সম্পদ-সমৃদ্ধি-প্রভূত্ব। এরা

বরাবরই ছিল ইংরেজ শাসকদের প্রতি মহাকৃতজ্ঞ। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যেও প্রগাঢ় ভক্তি-শ্রদ্ধা-আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে সবচেয়ে উচুতলার ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে। তিনি বলছেন,

> "নিম্নে ভুমিতলে দ্বারের নিকট যে প্রহরী বন্দুকের উপর সঙ্গীন চড়াইয়া দাঁড়াইয়া থাকে তাহার অপ্রসন্ন মুখে নিষেধের ভাব দেখা যায়, কিন্তু যে জ্যোতিষ্মান পুরুষ প্রাসাদের শিখরদেশে দাঁড়াইয়া আছে সে আমাদিগকে অভয়দান করিয়া আহবান করিতেছে। । ঐ দুর্মুখ প্রহরীটাকে আমরা ভয় করি .... কিন্তু সেই প্রসন্নমূর্তি মুখের দিকে আমরা আশান্বিত চিত্তে চাহিয়া থাকি। ইহাকেই কি ভক্তির অভাব বলে। এক ইংরাজ আমাদের দিকে কটমট করিয়া তাকায় । আর এক ইংরাজ উপর হইতে আপন মহত্ত্বের প্রতি আমাদিগকে আহবান করে। এইজন্য ভয়ের অপেক্ষা ভক্তিই প্রবল হয়। আশঙ্কার উপরে আশাই জয়লাভ করে। এবং আমাদের এই আশাই রাজভক্তি।"

শিখরদেশের 'জ্যোতিষ্মান পুরুষ', 'প্রসন্নমূর্তি মুখ' অথবা উপরের 'আর এক ইংরাজ'ই মানব ইতিহাসের নৃশংসতম দস্যু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী। এরাই মহিমান্বিত হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে। এদের প্রতিই নিবেদিত তাঁর রাজভক্তি।

রবীন্দ্রনাথ লিখছেন,

> "নিজের স্বার্থকেই যদি ইংরাজ ভারতশাসনের প্রধান উদ্দেশ্য করিতেন তবে আমাদের এমন দুর্দশা হইত যে ক্রন্দন করিবারও অবসর থাকিত না"।

ইতিহাসকেই উল্টে দিয়েছে এই বক্তব্য। ইংরেজদের ভারত শাসনের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল উপনিবেশিক লুণ্ঠন। ভারতের জনগণও তাদের জীবন, অপরিসীম দুর্দশা ও রক্তের বিনিময়ে চিনেছিলেন প্রধান শত্রু ব্রিটিশ উপনিবেশবাদকে । তাঁরা ক্রন্দন করেননি, বরং যা করেছিলেন তা হল বারংবার বিদ্রোহ। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের রেশ শেষ হতে না হতে ছড়িয়ে পড়ে নীল বিদ্রোহ (১৮৬০-৬১), এরপর একে একে ওয়াহাবী বিদ্রোহ (১৮৬৩-৭৫), পাবনার কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭০ ও ১৮৮০), দাক্ষিনাত্যের বিশাল কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭৫), মাদ্রাজে রুম্পা বিদ্রোহ (১৮৭৮-৮৯), উড়িষ্যার খোন্দ বিদ্রোহ (১৮৬২-৯৪), মালাবারের মোপলা বিদ্রোহ (১৮৭৩-৯৬), ছোটনাগপুর কোল আদিবাসী বিদ্রোহ (১৮৫৭-১৯০০), বীরসা ভগবানের নেতৃত্বে মুন্ডা বিদ্রোহ ইত্যাদি। প্রতিটি বিদ্রোহই ছিল সামন্ততন্ত্র-বিরোধী এবং ব্রিটিশ-বিরোধী। মাঝে মাঝেই ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল এই সব বিদ্রোহ। ব্রিটিশ উপনিবেশিক রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী ও পুলিশ নির্মম হত্যাযজ্ঞ ও নিপীড়নের মাধ্যমেই এগুলোকে দমন করতে সক্ষম হয়েছিল। কৃষক, আদিবাসী ও জনগণ বিদ্রোহ করেছিলেন, পরাস্ত হয়েছিলেন, আবার বিদ্রোহ করেছিলেন আবার পরাস্ত হয়েছিলেন, আবার বিদ্রোহ করেছিলেন ....। এভাবেই 'আমি আবার আসব, আবার সারা দেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে তুলব' – কানুর সেই অমর মহাকাব্যকে সত্য করে তুলেছিলেন।

একই সময়কালের মানুষ রবীন্দ্রনাথ। জনগণের এইসব সংগ্রামের উত্তপ্ত স্পর্শ থেকে তিনি বা ঠাকুর পরিবারের লোকেরা বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। তারা নিরপেক্ষ বা নিষ্ক্রিয়ও ছিলেন না। পাবনা কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭০ ও ১৮৮০) সম্পর্কে সুমিত সরকার লিখেছেন, " জমিদার প্রাধান্যে চালিত ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন ছিল কৃষক সংগ্রামের প্রতি প্রচন্ড বৈরীভাবাপন্ন। এঁদের মুখপত্র 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকা পাবনার কৃষক আন্দোলনকে হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে মুসলমান কৃষকদের সাম্প্রদায়িক বিক্ষোভ হিসেবে চিত্রায়িত করার প্রয়াস পায়। প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িকতার কোন অস্তিত্ব কার্যত তখন ছিল না, যদিও

পাবনার অধিকাংশ কৃষক ছিল মুসলমান এবং জমিদাররা ছিল প্রধানভাবে হিন্দু।"[১০] ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সর্বোচ্চ নেতৃত্বে যুক্ত ছিল ঠাকুর পরিবার। রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক । সুমিত সরকার আরো লিখছেন, "পাবনা কৃষক বিদ্রোহে জমিদারদের মধ্যে প্রধানভাবে ক্ষতিগ্রস্থ একজন ছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথের বড় ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ১৮৭৩ সালের জুলাই মাসে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান।"[১১]

১৮৭৭ সালে রবীন্দ্রনাথ তখন কিশোর। বয়স ষোল বছর। "ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যুর আর্তনাদে শিহরিত, তখন লর্ড লিটন জনমানসে সাম্রাজ্যবাদী স্পর্ধা ও আতঙ্ক প্রচারের উদ্দেশ্যে মুঘল বাদশাহদের অনুকরণে দিল্লীতে বিপুল ব্যয়ে এক দরবার অনুষ্ঠান করেন। দেশীয় রাজন্যবর্গ, প্রভাবশালী ভূম্যধিকারিগণ এবং ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় আশ্রিত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য দিল্লীতে সমবেত হয়েছিলো। ভারতবর্ষের প্রতি এমন নিষ্ঠুর অবজ্ঞার প্রতিক্রিয়ায় উত্তেজিত কিশোর রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি রচনা করেন :

তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তবে এই সব দাসের দাসেরা, কিসের হরষে গাইছে গান?
ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক্ আমরা গাব না
আমরা গাব না হরষ গান,
এস গো আমরা যে ক-জন আছি; আমরা ধরিব আরেক তান।

কবিতাটি সে সময়ে প্রকাশিত হয়নি। পরবর্তীকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বপ্নময়ী' নাটকে এই কবিতাটি প্রচার করেন; অবশ্য তজন্য ঈষৎ সংশোধনের প্রয়োজন হয়েছিল, ব্রিটিশের জায়গায় মোগল শব্দ ব্যবহার করতে হয়েছিল।"[১২]

ষোল বছর বয়সী কিশোর রবীন্দ্রনাথ স্বতস্ফুর্তভাবে, অপ্রকাশ্যে ও সামান্য পরিমাণে হলেও ব্রিটিশের আনুগত্যকে হয়ত বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু সেই একই রবীন্দ্রনাথ, যখন ত্রিশ বছরের পরিণত যুবক, ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্য, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত, আনত ও মুখরিত। ব্রিটিশের অধীনে পরাধীনতাকে তিনি অভিহিত করছেন 'সুশাসন' হিসেবে। এই 'সুশাসন' এর বিরুদ্ধে কোন সংগ্রাম-বিক্ষোভ-বিদ্রোহ স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কাম্য হতে পারে না। তাই তিনি সেই জমায়েতেই বলছেন,

> "ইংরেজ সুশাসনে আমাদের যোদ্ধৃবর্গের যুদ্ধ করিবার অবকাশ কোথায়? অতএব যুদ্ধগৌরবের দ্বার যখন রুদ্ধ, তখন কি স্বভাবতই জাতীয় রাজনৈতিক গৌরবের প্রতি তাহাদের হৃদয় আকৃষ্ঠ হইবে না? যদি সত্য না হয় তবে যে কোন উপায়ে হৌক জাতিস্বভাবসুলভ যুদ্ধলালসা হইতে তাঁহাদের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া রাজ্যচালন ও শান্তিকার্যের মধ্যে তাঁহাদের গৌরবস্পৃহা চরিতার্থ করিতে দিবার চেষ্টা করা কি রাজপুরুষেরা উচিত জ্ঞান করেন না?"

পরাধীনতা থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম নয়, বরং ইংরেজদের 'রাজ্যচালন ও শান্তিকার্যে' সহযোগিতা করাই, রবীন্দ্রনাথের মতে, 'জাতীয় রাজনৈতিক গৌরব'! ব্রিটিশ বিরোধী বিক্ষোভ-বিদ্রোহ-যুদ্ধকে শান্তি ও সহযোগিতার পথে চালিত করার জন্য 'চিত্তকে বিক্ষিপ্ত' করতে হবে। এ প্রশ্নে ব্যকুল রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ রাজপুরুষদেরকেও 'উচিত জ্ঞান' দান

করছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে 'যুদ্ধগৌরবের দ্বার রুদ্ধ'। এখানেই তাঁর পরাজয়বাদ। পরাজয়বাদ, জনগনের বীরত্বপুর্ণ সংগ্রামকে বিরোধিতা, সংগ্রামবিমুখতা, শাসক সাম্রাজ্যবাদের প্রতি আনুগত্য-আপোষকামিতা-আত্মসমর্পণবাদ-শান্তিবাদ-সহযোগিতা অভিব্যক্ত হয়েছে তাঁর এই বক্তব্যে।

এটাই আলোচ্য নিবন্ধে তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের সারবস্তু। এই রাজনীতিতেই ছিল ব্রিটিশ শাসকদেরও স্বস্তি। এই রাজনীতি ধারণ করেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ১৮৮৫ সালে গঠিত হয়েছিল কংগ্রেস। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলছেন, "ইংরাজেরই মহিমা কংগ্রেসের অস্থিমজ্জার মধ্যে জীবন সঞ্চার করিতেছে । ..... ইংরাজ জাতি যে কত মহৎ কনগ্রেস না থাকিলে তাহার এত নিকট প্রমাণ পাইবার আমাদের অবসর হইত না। সেই প্রমাণ পাইবার অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছিল।" কারা যে ঘাপটি মেরে থাকা প্রকৃত শত্রু তাও তিনি বৃটিশ শাসকদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন, "কংগ্রেসের বিরোধী পক্ষে যোগ দিতে পারিব না। .... অতএব তোমরা কনগ্রেসের প্রতি সন্দিগ্ধভার দূর করিয়া কনগ্রেসের চতুর মৌনী বিরোধী পক্ষের প্রতি সন্দেহ স্থাপন করো।" ইংরেজ শাসকদের প্রতি ভক্তিপ্রকাশে তিনি দ্বিধাহীন, কিন্তু কোনরূপ বিরোধিতায় তিনি সম্মত নন। "তোমাদের প্রতি ভক্তি আছে বলিয়াই কথা কহি, নহিলে নীরব হইয়া থাকিতাম তাহার আর সন্দেহ নাই।" ভক্তির অভাব হলে তিনি বরং নীরবতা পালন করবেন। সামান্য ক্ষোভও প্রকাশ করবেন না।

পরবর্তী পর্ব ...

সৈয়দ আবুল কালাম: গবেষক, শিক্ষক ও নাট্যকার। প্রকাশিত নাটক - *তিনটি পথনাটক*।

তথ্যসূত্র

১। প্রভাতকুমার মুখোপধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক, প্রথম খন্ড, কলিকাতা, অগ্রহায়ন ১৪০১, পৃঃ ২৮৮

২। প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী তৃতীয় খন্ড, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৯৪, পৃঃ ১৪৪, নবভারত, পৌষ ১২৯৭

৩। স্বপন বসু - ইন্দ্রজিত চৌধুরী সম্পাদিত, উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি, কলকাতা, নভেম্বর, ২০০৩, পৃঃ ২৬৫

৪। ঐ, পৃঃ ২৭৬

৫। সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, কলিকাতা, এপ্রিল ১৯৮০, পৃঃ পনেরো

৬। স্বপন বসু সংকলিত ও সম্পাদিত, সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালিসমাজ, কলকাতা, এপ্রিল ২০০০, পৃ: ৪২৩

৭। এ আর দেশাই, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি, কলকাতা, ২০০১, পৃঃ ১৪৫

৮। প্রগতি প্রকাশন, ভারতবর্ষের ইতিহাস, মস্কো, ১৯৮৬, পৃঃ ৪৫৬

৯। সখারাম গনেশ দেউস্কর, দেশের অবস্থা, দুশো বছরের বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য, কলকাতা, ২০০৪, প্রথম খন্ড, পৃঃ ৪২৯-৪৩১

১০। Sumit Sarkar, Modern India 1885-1947, New Delhi, 1983, Page, 52

১১। ঐ, Page, ৫২

১২। অরবিন্দ পোদ্দার, রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৃঃ ২৫

আরো পড়ুন :
মুক্তমনায় সঙ্কলিত বিশেষ পাতা :

রবীন্দ্রনাথ : নির্মোহ বিশ্লেষনে মুক্তমনা লেখেকরা